দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 29 APR. 1998
পৃঃ ১ কলাম ২

দেখামাত্র গুলি কোন সভ্য পদ্ধতি নয়

সাধু সাবধান

পর্যবেক্ষক

গত কয়েকদিন ধরেই ছাত্র রাজনীতি, বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস, হল দখল, ছাত্র হত্যা— এসব বিষয় অনিবার্যভাবেই দখল করে নিচ্ছে পত্রিকার শিরোনাম। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ নিয়ে কেবল চিন্তিত নয়, রীতিমতো আতঙ্কিত আজ জনগণ। কেন হচ্ছে এসব? কে বা কারা নাড়াচ্ছে কলকাঠি? এ দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে কি মুক্তি নেই জাতির?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্পষ্টই বলেছেন, সমস্যাটি রাজনৈতিক। রাজনৈতিকভাবেই এর সমাধান করতে হবে। প্রশাসনিকভাবে কোন পদক্ষেপ নিলেও সে সমাধান স্থায়ী হবে না। উপাচার্যের এ বক্তব্যের বিরোধিতা কেউ করেননি। কিন্তু সমস্যার সমাধানে কোন রাজনৈতিক দল এগিয়ে এসেছে— সে রকমও দেখা যাচ্ছে না। বলে না দিলেও

(১১ পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

দেখামাত্র গুলি

(প্রথম পাতার পর)

বিবদমান পক্ষ দু'টির রাজনৈতিক পরিচয় আজ সকলের কাছেই স্পষ্ট। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে— দু'টি ছাত্র সংগঠনেরই কেন্দ্রীয় কমিটি কিন্তু মূল রাজনৈতিক দলের শীর্ষ ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত। তিনিই ঠিক করে দেন— কে হবে সভাপতি, কে সাধারণ সম্পাদক। তারপর সেই সংগঠন যখন লিপ্ত হয়ে পড়ে মরণঘাতী সন্ত্রাসে তখন দায়িত্ব কিছুটা হলেও বর্তায় মূল রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপরেই। কিন্তু বাস্তবে প্রধান দু'দলের নেতা-নেত্রীর আচরণে সে দায়িত্ব পালনের কোন নমুনা জনগণ বোধকরি দেখতে পাচ্ছে না। তাঁদের ভূমিকা বিবদমান একটি পক্ষের প্রতিনিধির মতোই। নিজের ছেলেদের কোন দোষই দেখছেন না তাঁরা। ঢালাও অভিযোগ করে যাচ্ছেন বিরোধী পক্ষের। ফলে জটিলতা বেড়েই চলেছে ক্রমাগত। রাষ্ট্র ক্ষমতায় যখন যাঁরা থাকছেন— তাঁদের অনুগত সন্ত্রাসীরা পুলিশের কাছে ছাড় পেয়ে যাচ্ছে। একচোখা দৈত্যের মতো আচরণ করছে পুলিশ অধিকাংশ সময়েই। এ বিষয়টি বর্তমানে যেমন সত্য তেমনই সত্য ছিল বিগত সরকারের আমলে।

এ আচরণ অনাকাঙ্ক্ষিত, যে কোন ধরনের সমঝোতা বা সুস্থ সহাবস্থানের প্রতিবন্ধক। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট নেতা-নেত্রীরা যে বোঝেন না একেবারেই— সেটিও তো রীতিমতো অবিশ্বাস্য তারপরও হচ্ছে এসব। যেন অনেকটা নিয়মেই পরিণত হয়ে গেছে। বহুল সমালোচিত এ নিয়মকে স্থায়ী রূপ দিতেও যেন উঠেপড়ে লেগেছে স্বার্থান্বেষী একটি গোষ্ঠী। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে পুলিশের ভূমিকা। বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের দলন-নিপীড়নে তাদের মনোভাব প্রায়ই অতি উৎসাহীর মতো মনে হয়। কাউকে ডেকে আনতে বললে পিঠমোড়া করে বেঁধে মারতে মারতে আনাটাকেই তারা কর্তব্যকর্ম বিবেচনা করে। পুলিশের এহেন আচরণের চরমতম উদাহরণ দেখা গেল গত ২৬ এপ্রিল রবিবার। ছাত্রদলের মিছিল থেকে আটককৃত অর্ধশতাধিক ছাত্রকে তারা পুলিশ কন্ট্রোল রুম প্রাঙ্গণে প্রখর রোদের নিচে উদোম গায়ে বসিয়ে রেখেছে। পরদিন বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে দেখা গেছে এ ছবি।

এ ঘটনা কতটা মানবিক— তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠতে পারে। সরকারের উর্ধতন মহল এ ঘটনার উৎসাহদাতা কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে অনেকেরই। তাদের মতে, অতিউৎসাহী পুলিশেরই অপকর্ম এটি। কারও কারও মতে, যে গোষ্ঠীটি এ কাজে মদদ জুগিয়েছে তাদের মূল উদ্দেশ্য আসলে সরকারকেই অজনপ্রিয় করে তোলা। আটক ছাত্রদের খালি গায়ে রোদে বসিয়ে রাখার বিষয়ে একটি ভিন্নমত অবশ্য পাওয়া গেছে। এদের মতে, আটক ছাত্ররা নিজেরাই পরিকল্পনা করে সবাই একযোগে শার্ট, গেঞ্জি খুলে ফেলে পুলিশী আচরণের প্রতিবাদ হিসাবে। এটিও যদি সত্য হয়, সে ক্ষেত্রেও কিন্তু রবিবারের পুলিশী আচরণ নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। ছাত্রদলের যে মিছিল থেকে তাদের সভাপতিসহ অর্ধশত নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল— সেখানে কোন ককটেল ফোটেনি, কারও কাছে অস্ত্র পাওয়া যায়নি। মোটামুটিভাবে শান্তিপূর্ণ মিছিলই ছিল সেটি। পুলিশ হয়ত বলবে— মিছিলটিকে কাকরাইলের মোড়েই শেষ করে না দিলে পরবর্তীতে এটিই ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারত। পুলিশের এ দূরদর্শিতা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রশ্ন জাগে— বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি সন্ত্রাসী ঘটনার প্রাক্কালে তাদের এই প্রজ্ঞা কোথায় থাকে? এ যাবত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ যতবার ক্যাম্পাসে ঘটেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগেভাগে তা জেনে গেছে ছাত্রছাত্রীরা। সবাই জেনেছে, জানেনি শুধু পুলিশ। এমনকি কার কার হাতে অস্ত্র আছে, কারা চাঁদাবাজি করে— বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা পর্যন্ত জানে। জানে না শুধু পুলিশ!

এই যদি হয় পুলিশের কর্মকাণ্ডের নমুনা, তাহলে হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান সব সময়ই হবে ঝুঁকিপূর্ণ। অথচ এখন সে পাঁয়তারাই চলছে। সন্ত্রাসী দেখামাত্রই পুলিশকে গুলি করার ক্ষমতা দেয়া যায় কিনা তা নিয়ে এখন আলোচনা চলছে। ক্ষমতার শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিরাই এ আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন বলে এদিকে নজর না দিয়ে উপায় থাকছে না। তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে— বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায়ই বেশি ক্ষমতা ভোগ করে থাকে আমাদের পুলিশ। ওয়ারেন্ট ব্যতিরেকেই যে কোন নাগরিককে আটক করতে পারে পুলিশের একজন থানা পর্যায়ের কর্মকর্তা। এছাড়া বিশেষ ক্ষমতা আইনতো রয়েছেই। এসব আইনের সুফল এখনও পর্যন্ত পেয়েছে কোন সাধারণ মানুষ— এমন উদাহরণ দেয়া কষ্টকর। এর ওপর যদি আবার দেখামাত্র গুলির ক্ষমতা দেয়া হয় তাহলে তো পোয়াবারো। আইন প্রয়োগকারী নিজেই বিচারকের ভূমিকা পালনের উদাহরণ সভ্য কোন দেশে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। মনে রাখা দরকার, সামরিক আইন অথবা কার্ফ্যু জারি করা ছাড়া অন্য কোন পরিস্থিতিতে দেখামাত্র গুলি করার ক্ষমতা কোন সভ্য দেশের পুলিশের নেই।

পুলিশের ভূমিকার বাইরে আন্দোলনকারীদের কর্মকাণ্ড নিয়েও কিছু কথা বলা যায়। গত রবিবারের ভূমিকার কথাই ধরা যাক। পুলিশ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ছাত্রদলের বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা কাকরাইল ও ফকিরেরপুলে বেশ কিছু গাড়ি ভাংচুর করেছে। পুলিশের কর্মকাণ্ডকে যদি আমরা সম্পূর্ণ অন্যায় বলে ধরেও নেই, তারপরও গাড়ি ভাঙ্গার যৌক্তিকতা কোথায়? প্রচলিত আইনে গাড়ি ভাঙ্গা অপরাধ। গত মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী নিজে এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছেন। অথচ সেদিন গাড়ি ভাঙ্গার অপরাধে ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি। তারা গণহারে আটক করেছে রাজনৈতিক মিছিল থেকে। অথচ মিছিল করা একটি গণতান্ত্রিক অধিকার।

পর্যবেক্ষক মহলের মতে, যে সমস্যাগুলো সম্পূর্ণই রাজনৈতিক তার সমাধান সেভাবেই করা দরকার। সন্ত্রাসীদের নিজ দলে প্রশ্রয় দিয়ে, পরে আবার প্রশাসনিকভাবে লোক দেখানো চেষ্টার ফাঁকিগুলো এখন জনগণ ঠিকই টের পেয়ে যাচ্ছে। এতে করে প্রচলিত রাজনীতির ওপরেই ক্রমশ আস্থা হারাচ্ছে জনগণ। অতএব সাধু সাবধান!